গণবিজ্ঞান ভাবনার পত্রিকা

বিজ্ঞান অন্বেষক

বর্ষ-১৪ সংখ্যা-৫ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৭ WBBEN/2003/11192 মূল্য : ৫ টাকা

২
অশান্তির মৌল ও একটি দেশ
৪
খাদ্যে ভেজাল
৫
মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা
৬
প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ও বেঙ্গল কেমিক্যাল
৮
উড়ানের শুরুর দিকে
৯
স্বাস্থ্য
১০
কুসংস্কার
১১
অঙ্ক
১২
সংবাদ
১৩
জানো কি?
১৪
মহাকাশ
১৬
কবিতা/কার্টুন/শব্দের খোঁজে

উড়ানের শুরুর দিকে

(১)

(২)

(৩)

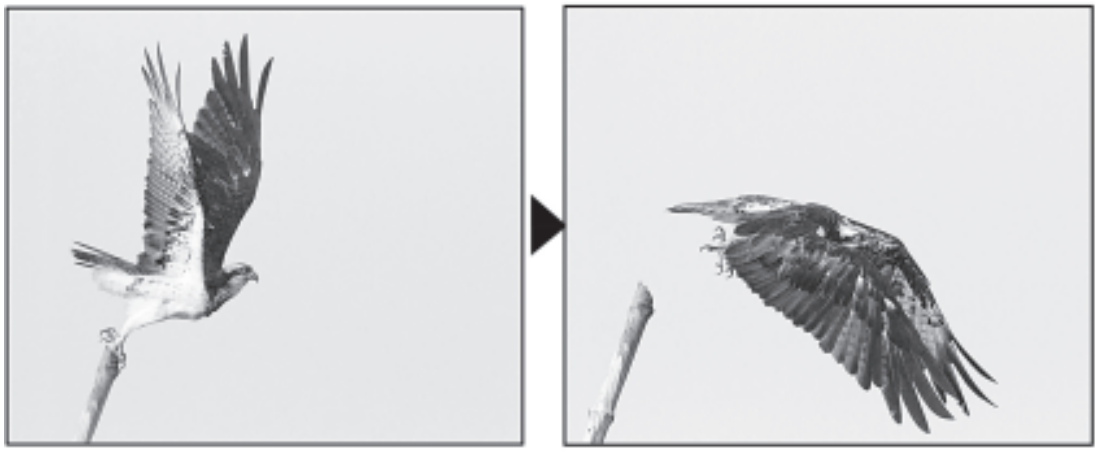

আমাদের কথা

উন্নয়ন ও বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের ফল উন্নয়ন। কিন্তু প্রশ্ন—প্রকৃত উন্নয়ন কি? কিংবা প্রশ্ন—উন্নয়ন কাদের জন্য? একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। স্বাধীনতার পর পরই ১৯৬১ সালে গঙ্গা নদীকে ফরাক্কা ব্রীজ দিয়ে বাঁধা হল। উদ্দেশ্য—নদীর জলকে নিয়ন্ত্রণ করে জলসেচের ব্যবস্থা করা ও বন্যা রোধ করা। বলা হল—এই ব্রীজ স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির একটি দিক্‌চিহ্ন। তাই ব্রীজ নির্মাণের জন্য হাজার একর বন ও তার জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করা হল। কয়েক পুরুষ ধরে বসবাসরত টান্ডা গ্রামের আদিবাসীদের ন্যূনতম ক্ষতিপূরণ ছাড়াই উচ্ছেদ করা হল। কিন্তু নির্মাণের এত বছর পরে বন্যার জন্য সেই ফারাক্কাকেই পরোক্ষে দায়ি করা হচ্ছে। নির্মাণের পূর্বে নদী থেকে যে নালা বা খাড়িগুলি সেচের জন্য প্রাণস্বরূপ ছিল জলস্রোতের অভাবে তারা মজে নষ্ট হয়ে গেল। অন্যদিকে নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় বর্ষার সময় অতি বৃষ্টিতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলের পরিধি অনেকগুণ বেড়ে গেলো। তাই, প্রশ্নটা থেকেই গেলো—উন্নয়ন কি? কাদের জন্য?

অশান্তির মৌল ও একটি দেশ

অমিতাভ চক্রবর্তী

বেঁচে থাকার প্রয়োজনে প্রতি মুহূর্তে চেনা-অচেনা কতই না পদার্থের সঙ্গে আমাদের সংযোগ ঘটে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই পদার্থগুলিকে মৌলিক, যৌগিক ও মিশ্র এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এদের মধ্যে মৌলিক পদার্থই হল পদার্থের সরলতম রূপ। বিভিন্ন মৌল রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়ে বা কেবলমাত্র পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে নানা রকম যৌগিক বা মিশ্র পদার্থ উৎপন্ন করে। প্রকৃতিতে মৌল বা মৌলিক পদার্থের সংখ্যা প্রায় একশ-র কাছাকাছি এবং এই মৌলগুলির মধ্যে আবার তিন চতুর্থাংশই ধাতু। কিন্তু এত ধাতু থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম সহ চেনা কয়েকটি ধাতু ছাড়া আর কোনো ধাতুর ব্যবহার নিয়ে মানব সভ্যতা বিশেষ মাথা ঘামায়নি। কেবলমাত্র গুটিকয় বিজ্ঞানীর গবেষণা এবং পাঠ্যবইতে রসায়নের বিষয়বস্তু হিসাবেই বাকি ধাতুগুলির কথা লোকের জানা ছিল। তবে ১৯৫০ এর পর থেকে অবস্থাটা দ্রুত পাল্টে যেতে থাকে। প্রযুক্তিগত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই আপাত অচেনা ধাতুগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা ও সুবিধাগুলি আমাদের কাছে প্রকট হতে থাকে। যেমন ম্যাগনেটিং রেজোনেন্স ইমেজিং (MRI)-এ গ্যাডোলিনিয়াম (Gadolinium) বা শক্তিশালী লেজার উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিয়োডিমিয়াম (Neodymium)-এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। একই ভাবে স্ক্যানডিয়াম (Scandium) নামক আরেকটি ধাতু ইদানিং কালে অ্যালুমিনিয়ামের সাথে টাংস্টেনসদৃশ সংযোগকারক হিসাবে হালকা ও শক্তিশালী হেলিকপ্টার বা মোটরবাইকের কাঠামো তৈরিতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

তবে ইলেকট্রনিক্সের যুগে প্রযুক্তিবিদ্যার এত উন্নতিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিওবিয়াম (Niobium) ও ট্যান্টালাম (Tantalum) নামে দুটি ধাতুর, যারা ইতিমধ্যেই বিরোধ সৃষ্টিকারী মৌল হিসাবে চিহ্নিত। (নিওবি এবং ট্যান্টালাস এই দুই গ্রীক পৌরাণিক চরিত্রের নামানুসারে মৌলদুটির নামকরণ। আর আশ্চর্যজনক ভাবে পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী কন্যা নিওবি ও তার বাবা ট্যান্টালাস তাদের অপকর্মের জন্য আজীবন সাজাপ্রাপ্ত এবং ঘৃণা উদ্রেককারী দুটি চরিত্র)। তবে এই দুর্নাম কিন্তু কোনো সুদূর অতীতের নয়, মাত্র কয়েক দশক আগের।

মৌলদুটির বিশেষ তাপ প্রতিরোধকারী ক্ষমতা, ঘনত্ব, তড়িৎ ধরে রাখার ক্ষমতা এবং কম ক্ষয়কারী ধর্মের জন্য মোবাইল ও নানারকম ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রপাতি (বিশেষতঃ ক্যাপাসিটর) তৈরিতে এরা অত্যন্ত উপযোগী। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে মোবাইল প্রযুক্তিতে এই ধাতুদুটির (প্রধানতঃ ট্যান্টালাম) ব্যবহার বাড়তে থাকে। আর এর প্রধান সরবরাহকারী ছিল জাইরে (Zaire) নামে কেন্দ্রীয় আফ্রিকার একটি দেশ যার বর্তমান নাম ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো। উগান্ডা, বুরুন্ডি, রোয়ান্ডা, কঙ্গো সহ নয়টি দেশের প্রায় দু'শো জাতির মানুষদের মধ্যে চরম বিদ্বেষের বাতাবরণে কেন্দ্রীয় আফ্রিকা তখন আশান্ত। অশিক্ষা, খাদ্যাভাব, ঘন জঙ্গল ও যোগাযোগের চূড়ান্ত অব্যবস্থায় কঙ্গো যেন গৃহযুদ্ধের আদর্শ পরিবেশ। এই অবস্থায় দেশটির দুর্দশায় সংযোজিত হল ট্যান্টালাম, নিওবিয়াম ও মোবাইল প্রযুক্তি। ট্যান্টালাম-নিওবিয়ামের প্রধান আকরিক হল কোলটান (Coltan)। আর পৃথিবীর প্রায় ৬০% কোলটানের ভান্ডার হল কঙ্গো, যেখানকার স্থানীয় খাঁড়ি ও নদী উপত্যকায় ঘন কাদার আকারে এই আকরিক পাওয়া যায়। ফলে তা সহজেই সংগ্রহ ও পরিবহন যোগ্য। ২০০০ সাল নাগাদ অত্যন্ত দামী এই আকরিকের প্রতি টন পরিমাণের বাজারমূল্য ছিল প্রায় ২০০,০০০ ডলার (তখনকার বাজারে ভারতীয় ৯,০০০,০০০ টাকা)। দেখা গেল কেবল এই আকরিক সংগ্রহ ও বিক্রি করেই একজন কৃষক তার আগের চেয়ে ২০ গুন বেশি আয় করতে পারে। দেখতে দেখতেই পুরো দেশ যেন তাদের পুরুষানুক্রমিক পেশা কৃষিকাজ বন্ধ করে আকরিক সংগ্রহে মেতে উঠল। অধিকাংশ মানুষই জানত না এই কোলটান আসলে কি এবং কি কাজেই বা তা লাগে। একদিকে অশিক্ষা, অনুন্নতি ও অপর্যাপ্ত খাবারের যোগান অপরদিকে প্রচুর অর্থের হাতছানি। ঠিক এই অবস্থায় আকরিক সংগ্রহ, এলাকা দখল, পরিবহন প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে দ্রুত গড়ে উঠছিল কিছু সক্রিয় দালালচক্র ও মাফিয়া বাহিনী, যারা এলাকা ভিত্তিক ভাবে প্রায় পৃথক প্রশাসন চালাতে সক্ষম ছিল। সহজ অস্ত্রের যোগান, লোভ, হিংসা ও অবিশ্বাসের আবহকে ত্বরান্বিত করতে এইভাবেই প্রায় এক দশক ধরে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল কোলটান তথা ট্যান্টালাম ও নিওবিয়াম নামক আপাত নিরীহ দুটি ধাতু। একটি সমীক্ষা অনুযায়ী ১৯৯১ থেকে ২০০১ এই দশ বছরে পশ্চিমী দেশগুলোতে মোবাইল ফোনের বিক্রি শূন্য থেকে বেড়ে প্রায় এক লক্ষ কোটি হয়ে গিয়েছিল। আর এই গৃহযুদ্ধ চরম আকার নেয় ১৯৯৮ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে। ২০০৩ সালের ২৩শে অক্টোবর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী এই অরাজকতার পরিবেশে কেবলমাত্র কঙ্গোতেই প্রাণ হারিয়েছিলেন প্রায় ৫৪ লক্ষ মানুষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রাণহানির নিরিখে যা বৃহত্তম। অবশেষে বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহে মোবাইল তৈরির বহুজাতিক সংস্থাগুলি বুঝতে পারে যে কোলটান সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অরাজকতা বৃদ্ধিতেও তারা কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করছে। তারা কঙ্গো থেকে কোলটান সংগ্রহ বন্ধ করে দেয়। ২০০৩ সাল থেকে এই সংস্থাগুলি অস্ট্রেলিয়া থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি দামে কোলটন কেনার সিদ্ধান্ত নেয়। খানিকটা যেন দমে আসে যুদ্ধ পরিস্থিতি। অবশেষে সরকারিভাবে ওই একই বছর যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয়। কিন্তু অশান্তির চোরা স্রোত কিছু কিছু এলাকায় বইতেই থাকে, বিশেষতঃ রোয়ান্ডা সংলগ্ন দেশের পূর্বাঞ্চলে। এরই মধ্যে অপর এক ধাতু টিন (tin) এই বিরোধ সৃষ্টিকারী মৌলের তালিকায় নবতম সংযোজন হিসাবে কঙ্গো গৃহযুদ্ধে নতুন মাত্রা যোগ করে। কারণ ইতিমধ্যেই টিন সরবরাহকারী হিসাবে দেশটি আন্তর্জাতিক বাজারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। আর ২০০৬ সালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সমস্ত ঝালাই (soldering)-এর কাজে যখন সিসা (lead)-র পরিবর্তে টিনের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে দেয় তখন তো এই চাহিদা আরও বৃদ্ধি পায়। ফলে কোনো না কোনো ভাবে ধাতু নিয়ে যুদ্ধ চলতেই থাকে। স্থানীয় সমস্যা, জাতিগত বৈরীতা, ক্ষমতাশালী বহির্বিশ্বের অভিসন্ধি ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার সঙ্গে এই ধাতব-অর্থনীতি মিলেমিশে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

ইংরাজী সাহিত্যের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জোসেফ কনরাড একদা কঙ্গোকে 'লুঠ করার জন্য জঘন্যতম কাড়াকাড়ি যা চিরকাল মানবতার বিবেকের ইতিহাসকে বিকৃত করেছে (the vilest scramble for loot that ever disfigured the history of human conscience)' বলে অভিহিত করেছিলেন। আজ এত বছর পরেও কনরাডের এই কথাগুলি দেশটির বাস্তব পরিস্থিতির বিচারে খুব বেমানান কী?

E.mail.acnbu13@gmail.com • M : 9434377067

প্রিয় পাঠক

- পত্রিকার জন্য আপনিও লেখা পাঠাতে পারেন। বিজ্ঞান অনুসন্ধানী অপ্রকাশিত লেখা পাঠান।
- পত্রিকার সমালোচনা, পরামর্শ, গুণমান বিষয়ে অপানার সুচিন্তিত মতামত সাদরে গ্রহণ করব।
- পত্রিকার গ্রাহক হোন। বছরে ছ'টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা তিরিশ টাকা। ডাকযোগে আপনার বাড়িতে পত্রিকা পাঠিয়ে দেব আমরাই।
- বিজ্ঞান ও পরিবেশ সংক্রান্ত কাজের খবরাখবর ছবিসহ মেল করে পাঠান।
- যোগাযোগ করুন। *M : 8336043048, 9874778216, 9432335882*

পত্রিকা যোগাযোগ

চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা • M. 9332283356
জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব • M. 9232387401
প্রতাপদীঘি লোকবিজ্ঞান সংস্থা • M. 9732681106
কলকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা • M. 9477589456
তপন চন্দ, মাদারীহাট, আলিপুরদুয়ার • M. 9733153661
কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম • M. 9434686749
গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ • M. 9593866569
পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ, বারাকপুর • M. 9331035550
বুক মার্ক, বৈচিত্র্য ও মনীষা (কলেজ স্ট্রিট)
স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উন্নয়ন • M. 9153320581

খাদ্যে ভেজাল ধরবেন কীভাবে ঃ মুড়ি

জয়দেব দে

মুড়ি সাড়া ভারতে বেশ জনপ্রিয় খাবাব। কি সকাল, কি দুপুর, কি সন্ধ্যাবেলা সব সময়েই মুড়ি খাওয়া যায়। সব দোকানেই মুড়ি পাওয়া যায়।

একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। ১৯৮৬ সাল। বাঁকুড়া জেলায় সরকারি চাকুরিতে যোগদান করি। সন্ধ্যাবেলায় টিফিন করতে আমার বন্ধু বাঁকুড়া কলেজ মোড়ে পাঁচুদার দোকানে নিয়ে গেল। আমি তো তাজ্জব বনে গেলাম। দেখি সকলেই এক থালা করে মুড়ি, কয়েকটা ফুলুরি আর চপ নিয়ে জল দিয়ে মেখে বেশ তৃপ্তি করে খাচ্ছে। আমিও তাই। তারপর থেকে ভারতবর্ষের যেখানেই গেছি, দেখেছি মুড়ি বেশ পপুলার। মুড়ি কিভাবে তৈরি হয়?

মুড়ি বানাতে বিশেষ ধরনের সেদ্ধ চাল ব্যবহার করা হয়। এই সেদ্ধ চাল দুবার সেদ্ধ করা হয়। প্রথমে ধান ১ বা ২ দিন জলে ভিজিয়ে সেদ্ধ করার পর ফের আবার একদিন জলে ভিজিয়ে সেদ্ধ করে রোদে শুকিয়ে ভেনে নেওয়া হয়। এই ধান কলে ভানা হয় অথবা ঢেকিতে ছেঁটে নেওয়া হয়।

নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় এই চাল ভিজিয়ে, শুকিয়ে তার পর গরম বালিতে ভেজে মুড়ি তৈরি করা হয়। ভেজানোর সময় সামান্য নুন আর খাবার সোডা দেওয়া হয়। এই ধরনের মুড়ি কিছুটা লালচে ও সাইজে কিছুটা ছোট হয়। সাবেকি এই ধরনের মুড়ি তৈরির পদ্ধতি বেশ ঠিকঠাক চলছিল। এটা খেতেও বেশ সুস্বাদু। কোনো রকম ভেজালও ছিল না।

হঠাৎ ব্যবসায় লাভের অংক বাড়ানোর জন্য অসাধু ব্যবসায়ীরা এই সাবেকি মুড়িকে সাদা ধবধবে, বড় ও ফুলকো মুড়ি বানাতে চাইলেন। মুড়ির চালে নুন নয়, মেশাচ্ছেন ইউরিয়া। আর মুড়ি হয়ে উঠল বেশ সাদা, সাইজে বেশ বড় ও ধবধবে।

মুড়ির খাদ্যগুণ

ঢেকি ছাঁটা চালে :

কার্বোহাইড্রেট (৭৮%), স্নেহ পদার্থ (১.৭%), অজৈব লবণ (ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম) (১.১%), তন্তু (০.২%)।

এছাড়া অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড ও জলীয় অংশ থাকে।

কলে ছাঁটা চালে :

কার্বোহাইড্রেট (৭৯%), স্নেহ পদার্থ (০.৩%), অজৈবলবণ (ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম) (০.৪%), তন্তু (০.৬%)।

এছাড়া অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড ও জলীয় অংশ থাকে।

ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স প্রচুর থাকলেও চাল যখন ভাজা হয় তখন বেশ কমে যায়। কার্বনের পরিমাণ কিছুটা বাড়ে, ভিটামিন সি-র পরিমাণ অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়।

মুড়ি নিয়ে কিছু বিশ্বাস বিজ্ঞান :

কলে ছাঁটা মুড়িতে যে পরিমাণ ভিটামিন থাকে, ঢেকিতে ছাঁটা মুড়িতে তার চাইতে অনেক বেশি থাকে। সুষম খাদ্যের প্রয়োজন মেটাতে যে পরিমাণ শ্বেতসার, প্রোটিন, স্নেহ পদার্থ, খনিজ লবন ও ভিটামিন প্রয়োজন তা মুড়িতে ততটা পাওয়া যায় না। তাই পূর্ণবয়স্ক লোকদের শুধু মাত্র মুড়ি খেলে চলবে না। অনেকে বলেন সারাদিন মুড়ি খেয়ে কাটিয়ে দেব, এটা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। যেহেতু মুড়ির পুষ্টিমূল্য খুব বেশি নয়, তাই মুড়ি খেয়ে সারাদিন না কাটানোই ভালো। অনেকে ডায়ারিয়া হলেও মুড়ি ভেজানো জল খেয়ে তৃপ্তি লাভ করেন। ধারণা এই যে, নুন-সোডা মেশানো মুড়ি জল অম্লনাশক। এটা ভুল ধারণা। এই সোডা পাকস্থলির হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে খুব সামান্য প্রশমিত করলেও তা সাময়িক, পুরোপুরি পারে না, এর চেয়ে অনেক বেশি উপকারী সামান্য নুন চিনি মেশানো জল বা ও.আর.এস। যাদের বেশি ব্লাডপ্রেসার বা হৃদযন্ত্রের সমস্যা আছে, তাদের কম নুনের মুড়ি খাওয়া দরকার।

মুড়িতে ইউরিয়া কীভাবে ধরবেন :

অল্প পরিমাণ মুড়ি জলে ১০ মিনিট ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরে ছেঁকে জল সংগ্রহ করে তাতে ২ চামচ অড়হর ডালের গুড়ো মিশিয়ে সামান্য গরম করে ৫ মিনিট রেখে দিতে হবে। দ্রবণে ফিনপ্থ্যালিন মেশালে গোলাপী বর্ণ হলে বুঝতে হবে মুড়িতে ইউরিয়া আছে। ফিনপ্থ্যালিন না পেলে লাল লিটমাস ওই দ্রবণে ডোবালে যদি নীল বর্ণ হয়, তাহলে বুঝতে হবে মুড়িতে ইউরিয়া আছে।

কী কী ক্ষতি হয় :

১. কিডনির রোগ ২. লিভারের রোগ ৩. ক্যানসার ৪. পুরুষের অন্ডকোষের সেমিনিফেরাস টিবিউলকে প্রভাবিত করে সন্তান উৎপাদনে বাঁধা।

এককথায় ইউরিয়া আমাদের শরীরে নানা ধরনের সর্বনাশ ডেকে আনে, তাই ইউরিয়া সমৃদ্ধ মুড়ি না খেয়ে সাবেকি লালচে ও ছোট মুড়ি কিনে খান। আমরা ক্রেতারা যদি সবাই সাদা ধবধবে মুড়ি বর্জন করি, তবে দেখবেন সাদা মুড়ি বাজার থেকে একদিন উধাও হয়ে যাবে।

মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা কি বদলাচ্ছে

কৌশিক রায়

সুদূর অতীতে, গোন্ডোয়াল্যান্ড এবং আঙ্গারাল্যান্ড নামক দুটি মহাদেশীয় ভূখণ্ডের পারস্পরিক চাপে, টেথিস সাগরের তলদেশ থেকে ধাপে ধাপে উপরে উঠে আসে নবীন ভঙ্গিল পর্বত-হিমালয়। সেই হিমালয়ের অন্যতম অলংকার-তুষারশোভিত, বিশ্বের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ-মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা যে ৮৮৪৮ মিটার বা ২৯ হাজার ২ ফিট— সেটা পরিমাপ করেছিলেন বঙ্গদেশের অন্যতম ভূ-বিজ্ঞানী এবং নব্যবঙ্গ আন্দোলনের তরুণ বৈপ্লবিক নেতা— হেনরি ল্যুইস ভিভিয়ান ডিরোজিও-র সুযোগ্য ছাত্র— রাধানাথ সিকদার। এরপরে, নেপালের প্রলংকর ভূমিকম্পের মতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং মহাদেশীয় ভূখণ্ডগুলি (Tectonic Plates) পরস্পর সরে যাওয়ার ফলে, পৃথিবীর এই সর্বোচ্চ শৈলশিখর— 'সাগরমাথা' বা 'পীক ফিফ্‌টিন'-এর উচ্চতা বাড়ছে, না কমছে। সেটা নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন ভূবিজ্ঞানীরা।

সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, বা ভারতের ভূবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ থেকে জানানো হয়েছে— মাউন্ট এভারেস্টের প্রকৃত উচ্চতার আবার মাপজোক করা হবে। মাউন্ট এভারেস্ট থেকে মাত্র ২১৫ কিমি. পশ্চিমে অবস্থিত, নেপালের গোর্খা জেলার অন্তর্গত বারপাক গ্রামটিই ছিল দুই বছর আগেকার ভয়াবহ ভূকম্পনের উপকেন্দ্র (Epicenter)। প্রায় ১৫ কিমি গভীর এই উপকেন্দ্রে প্রবল ভূকম্পন, মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতার ওপর প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করছেন ভূবিজ্ঞানীরা। এই ভূআন্দোলনের ফলে ধাক্কা খেয়েছে ইউরেশিয় ভূখণ্ডটি। ফলে, মাউন্ট এভারেস্ট, উচ্চতায় কিছুটা কমেও যেতে পারে। এই পর্বতশৃঙ্গটির পুনরায় দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করতে পারলে ভারতীয় উপমহাদেশের নীচে মহাদেশীয় ভূখণ্ডগুলির গতিবিক্ষেপ কেমন হচ্ছে সেটাও জানতে পারা যাবে। সেজন্যই ভারতের সার্ভেয়র জেনারেল এস. সুব্বারাও জানিয়েছেন মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা আবার নিরূপণ করতে হবে। এরজন্য সময় লাগবে প্রায় মাস দুয়েকের মতো।

গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম পদ্ধতির (GPS) ও থিওডোলাইট নামক যন্ত্রের সাহায্যে এভারেস্ট শৈলশৃঙ্গের উচ্চতাকে আবার মূল্যায়ন করা হবে। আশ্চর্যের কথা প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্লদিউস তোলেমি, হিমালয় বা 'হিমাদ্রি'-র কথা, তাঁর 'আলমাজেস্ত' বইটির মধ্যে, 'ইমাউস' ও 'ইমোদি' শব্দদুটির (হিমাদ্রির গ্রীক অপভ্রংশ?) মাধ্যমে জানিয়েছিলেন। সেখানেও তিনি বলেছিলেন— এই পর্বতমালার মধ্যেই বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশিখর লুকিয়ে আছে— যার ওপরে মানব বিজয় কেতন উড়িয়েছেন তেনজিং নোরগে, এডমন্ড হিলারি, জুনকো তাবেই, রাইনহোল্ড মেস্‌নার, বাচেন্দ্রী পাল-এর মতো দুঃসাহসী পর্বতাভিযাত্রীরা। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা এবং সুপ্রিম কোর্টের পূর্বতন বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোন্‌স-ও, ১৭৮৪ সালে বারাণসী যাওয়ার পথে লিখেছিলেন মাউন্ট এভারেস্টের সঠিক উচ্চতা নিরূপণের প্রয়োজন আছে। বিহারের ভাগলপুর থেকে চোমো লাহ্‌রি এবং এভারেস্ট পর্বতশৃঙ্গ দুটির তুষার-গরিমা দেখে রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন জোন্‌স্‌। ১৮৫৬ সালে, তদানীন্তন সার্ভেয়ার জেনারেল স্যার জর্জ এভারেস্টের সুপারিশে এই পর্বতশৃঙ্গের উচ্চতা সর্বপ্রথম মাপা হয়। প্রমাণ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা আবার নিরূপণ করেন ১৯৫৫ সালে, সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ভূবিজ্ঞানী— ডাঃ বি. এল. গুলাটি। অবশ্য, ১৯৮৭ সালে পাকিস্তানের থেকে দাবি এসেছিল— কারাকোরাম পর্বতশৃঙ্গের অন্তর্গত গড্‌উইন অস্টিন নামক পর্বত-চূড়াটি, মাউন্ট এভারেস্টের থেকে উঁচু।

১৯৯৯ সালে মার্কিন পর্বত অভিযাত্রী-ব্র্যাডফোর্ড ওয়াশিংটন, জি.পি.এস যন্ত্রের সাহায্যে মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা দেখান ৮৮৫০ মিটার। চূড়াটির ওপর বরফস্তরের উচ্চতা-প্রায় ১ মিটারের মতো। চাইনিজ আকাদেমী অব সায়েন্সেস থেকে মাউন্ট এভারেস্ট-এর উচ্চতাকে ৮,৮৪৪.৪৩ মিটার পর্যন্ত বলা হয়েছে। এখনও, মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতার তারতম্য নিয়ে জল্পনা কল্পনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

M : 95476569779

প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং বেঙ্গল কেমিক্যাল

রাজদীপ ভট্টাচার্য

১৯০১ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিক। প্রেসিডেন্সি কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণির ক্লাস শুরু হবে। দুপুর ১২টা থেকে সেই বহুশ্রুত অধ্যাপকের ক্লাস। ছাত্রেরা উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে। দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়ল, বেয়ারা রেজিস্টার খাতা টেবিলে রেখে পাশে সরে দাঁড়াল। স্মিত-মুখে দরজা দিয়ে ঢুকলেন অধ্যাপক মশাই। বিলাত ফেরৎ, অথচ টাই বাঁধা নেই, গলাবন্ধ একটা কোট পরা। কোটটা সুতির, সাদা-কালো চৌখুপিওয়ালা ছিটের। রেজিস্টার খাতা খুলে নাম ডাকলেন ছাত্রদের, একটু-আধটু পরিচয় নিলেন। কিন্তু একটা বিষয় সবাইকে অবাক করল, অধ্যাপক মশায়ের গায়ে যেমন কোট অবিকল সেই রকমের কোট ওই বেয়ারার গায়ে। বিকেলবেলা ছাত্ররা বিষয়টা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের স্যার গুপীবাবুর কাছে জানতে চাইল। হাসতে হাসতে গুপীবাবু বললেন, 'হ্যাঁ হে, একটা থান কিনে চারটা কোট করিয়েছিলেন, দুটো বেয়ারাকে দিয়েছেন আর দুটো নিজে পরেন।'

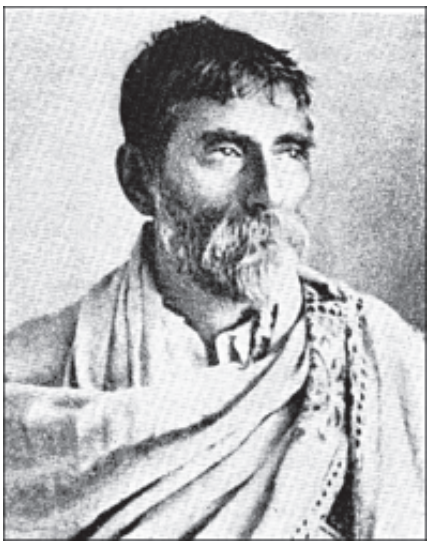

হ্যাঁ, আমরা আলোচনা করছি স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়'কে নিয়ে। বিশিষ্ট চরিত্রদের নিয়ে আলাপ আলোচনার সময়ে আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে মানুষটির দোষ ত্রুটি ভুলে গিয়ে একটা মহত্ত্বের আরোপিত গাউন তার গায়ে পরিয়ে দেওয়া। কিন্তু পি. সি. রায় এমন একজন মানুষ যার গায়ে ওইরূপ পোষাক পরানো মানে সোনাকে গিল্টি করা। তাঁর মতো একজন মানুষের আবির্ভাবের জন্য শুধু বিজ্ঞানজগত নয় একটা গোটা সমাজ, একাধিক প্রজন্ম এবং মানবিকতা যুগের পর যুগ অপেক্ষা করে থাকে। তাঁর স্নেহ, ভালোবাসা ও আদরে পরবর্তী কয়েক প্রজন্মের ভূত-ভবিষ্যৎ সুনির্দিষ্ট হয়।

১৮৬১ সালের ২ আগস্ট খুলনা জেলার রাড়ুলী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে প্রফুল্লচন্দ্র রায় ওরফে ফুলু'র জন্ম হয়। আত্মচরিতে তিনি লিখেছেন 'আমি জন্মেছিলাম সেই কালে যখন বাঙালির ছিল গোলা ভরা ধান, দেহ-জোড়া স্বাস্থ্য, গোয়াল-ভরা গরু, পুকুর-ভরা মাছ। কামার, কুমার, ধোপা, নাপিত সব ছিল বাঙালি। গ্রামে গ্রামে কত বারোয়ারি উৎসব আর বার মাসে তের পার্বণ।' কপোতাক্ষনদের এক পারে রাড়ুলী আর অপর পারে মধুসূদনের স্মৃতিধন্য সাগরদাঁড়ি। এই রাড়ুলী গ্রামে বাবা হরিশচন্দ্র রায়চৌধুরী ও মা ভুবনমোহিনী দেবীর ছয় সন্তানের অন্যতম প্রফুল্ল ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল। ন'বছর বয়স পর্যন্ত গ্রামের মাইনর স্কুলে পড়াশুনা করে তিনি ১৮৭০ সালে কলকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ার সময় পেটের সমস্যায় বছরখানেক অসুস্থ হয়ে দেশে ফিরে যান। আবার ফিরে এসে অ্যালবার্ট স্কুলে ভর্তি হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন কলেজে এফ. এ. ক্লাসে ভর্তি হলেন প্রফুল্ল। কিন্তু মেট্রোপলিটন কলেজে রসায়ন পড়ানো হত না বলে তিনি রসায়নের পাঠ নিতেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। সেখানে পেডলার সাহেবের পড়ানো তাঁকে রসায়ন শাস্ত্রে বিশেষ আকৃষ্ট করে তোলে। যদিও বাংলা সাহিত্যের প্রতিও তাঁর বিশেষ ভালোবাসা ছিল। তবু এসময়েই বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আত্মনিবেদন সুনির্দিষ্ট হয়। তিনি লিখেছেন, 'আমি সাহিত্যের মায়া কাটিয়ে বিজ্ঞানেরই আনুগত্য স্বীকার করলাম এবং ক্রমে বিজ্ঞানেরই একজন একনিষ্ঠ সেবক হলাম।'

পরবর্তীকালে নিজের পরিশ্রমে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় সফল হয়ে 'গিলক্রাইস্ট স্কলারশিপ' পেয়ে ১৮৮২ সালে প্রফুল্লচন্দ্র চড়ে বসলেন ইংল্যান্ডের জাহাজে। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা নিয়ে বি.এস.সি. পাঠে ভর্তি হলেন। ১৮৮৭ সালে পেলেন ডি.এস.সি. উপাধি। এ সময়ে তাঁর গবেষণা-নিবন্ধ উচ্চ প্রশংসিত হয় এবং তার জন্য প্রফুল্লচন্দ্র 'হোপ পুরস্কার'-এ ভূষিত হন। এমত সময়ে তাঁর লেখা 'India before and after the Mutiny' গ্রন্থটি সে দেশে বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। দেশে ফিরে ১৮৮৯ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন বিভাগে সহকারী অধ্যাপক রূপে যোগ দেন। শিক্ষাদানের পাশাপাশি চলে গবেষণার কাজ।

১৮৯৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন বিভাগে আধুনিক মানের ল্যাবরেটরি চালুর সঙ্গে সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের গবেষণার কাজে যেন জোয়ার এল। এই সময়ে ঘটল সেই অভূতপূর্ব ঘটনা। প্রফুল্লচন্দ্রের ভাষায়, 'মার্কিউরাস নাইট্রাইট আবিষ্কার করার পর আমার জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হল। একদিন ল্যাবরেটরিতে পারদের ওপর অ্যাসিডের ক্রিয়ার দ্বারা মার্কিউরাস নাইট্রাইট তৈরি করতে গিয়ে আমি কাচের পাত্রটির নীচে হলদে রঙের দানা (crystal) পড়তে দেখে একটু অবাক হলাম। প্রথমে মনে হয়েছিল এ কোনো basic salt; কিন্তু ওই রকম প্রক্রিয়া দ্বারা ওই শ্রেণির সল্টের উৎপত্তি সাধারণ অভিজ্ঞতার বাইরে। যাইহোক প্রাথমিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হল যে এটা মার্কিউরাস সল্ট ও নাইট্রাইট-দুইই।' এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক পেডলার বলেন 'P. C. Roy by his discovery of the method of preparation of the compound (Mercurous Nitrite) has filled up a blank in our knowledge of the Mercury series.' এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে এই আবিষ্কারের কথা প্রকাশ পাওয়ার পর ইউরোপের বৈজ্ঞানিক সমাজে তা বিশেষ আলোড়ন তুলল। পরবর্তীকালে প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর গবেষণায় তেরটি বা তার অধিক নতুন পারদ ঘটিত যৌগ আবিষ্কার করেন। নাইট্রাইট ও হাইপো নাইট্রাইট বিষয়ে তাঁর বৈচিত্র্যময় গবেষণাকর্মের জন্য তাঁকে 'Master of Nitrites' বলা হয়।

বিশিষ্ট ফরাসী রসায়নবিদ্ বার্থেলোর সঙ্গে মতবিনিময় করার সময় রসায়ণ জগতে প্রাচীন সংস্কৃত রসায়ন বিষয়ক বইগুলি যেমন অষ্টাঙ্গ হৃদয়, রসেন্দ্রসার সংগ্রহ, রমেন্দ্র চিন্তামণি, শার্ঙ্গধর সংহিতা, চক্রদত্ত সংগ্রহ, রসরত্নাকর ইত্যাদি তিনি যত্ন সহকারে পাঠ করেন এবং ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে থাকেন। অবশেষে এই সকল অভিজ্ঞতা ১৯০২ সালে প্রকাশিত যুগান্তকারী গ্রন্থ 'A History of Hindu Chemistry'-র জন্ম দেয়। এই বইতে তিনি প্রমাণ করেন যে প্রাচীন হিন্দুরা বিজ্ঞান তথা রসায়ন শাস্ত্রে ছিল আত্মনির্ভর, উন্নত এবং অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্বের পথ প্রদর্শক।

প্রফুল্লচন্দ্র শুধুমাত্র একজন শ্রেণিকক্ষের শিক্ষক কিংবা ল্যাবরেটরীর চার দেওয়ালের মধ্যে দক্ষ গবেষক ছিলেন না। তিনি ছিলেন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নিবেদিত প্রাণ। তাঁর অর্থে, তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হত কত দরিদ্র মেধাবী ছাত্রেরা। তিনি ছিলেন বাঙালির অন্যতম অভিভাবক। বন্যায়, দুর্ভিক্ষে তাই বার বার প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর ছাত্রদের নিয়ে ভিক্ষার ঝুলি হাতে কলকাতার পথে নেমেছেন। বাঙালির সমাজ জীবনকে পণপ্রথা, অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ এইসব কুসংস্কারের আগল থেকে মুক্ত করে তুলতে তিনি আমরণ চেষ্টা করেছেন। বাঙালির শিল্পোদ্যোগের ইতিহাসে প্রফুল্লচন্দ্রের কীর্তি চিরস্মরণীয়।

১৯৯২ সালে প্রফুল্লচন্দ্র তখন ৯১নং আপার সার্কুলার রোডে ভাড়া রয়েছেন। সেই বাড়িতে ওই সালেই প্রতিষ্ঠা পেল 'বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্'। রীতিমতো মার্কেট রিসার্চ করে কি ধরনের রাসায়নিক ও ঔষধপত্রের বাজারে চাহিদা রয়েছে তা বুঝে নিয়েছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। উৎপন্ন দ্রব্যের মান যাচাই করা হত প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবরেটরিতে।

সাইট্রিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি তৈরির পরিকল্পনা পেরিয়ে তিনি নজর দিলেন ক্যালসিয়াম সুপার ফসফেট উৎপাদনের দিকে। রাজাবাজারের কসাইদের কাছ থেকে কয়েক বস্তা কাঁচা হাড়গোড় কিনে শুকোতে দিলেন বাড়ির ছাদে। টানা কদিনের বৃষ্টিতে হাড়ে লেগে থাকা মাংস পচে যেমন দুর্গন্ধ ছড়ালো তেমনি কাক প্রভৃতির দ্বারা পশুর হাড় পৌঁছতে লাগল প্রতিবেশী বাড়িগুলিতে। তাদের হাত থেকে নিস্তার পেতে হাড়গোড় নিয়ে রাখা হল এক বন্ধুর ফাঁকা জমিতে। ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে সেই হাড় পোড়াতে গেলে আর এক বিভ্রাট। আগুন দেখে ছুটে এল পুলিশ। সব সমস্যার শেষে হাড়পোড়া ছাই থেকে গবেষণাগারে যখন ফসফেট অফ সোডার ক্রিস্টাল তৈরি হতে লাগল তার এক দলা মুখে দিয়ে তৃপ্তির হাসি হাসলেন প্রফুল্লচন্দ্র। এভাবে স্বল্পমূল্যে বিপুল পরিমাণ স্নায়ু বলবর্ধক ওষুধ তৈরি হতে লাগল। ধীরে ধীরে সিরাপ-ফেরি-আয়োডাইড, লাইকার বিস্মাথ, লাইকার আর্সেনিক্যালিস, স্পিরিট ইত্যাদিও উৎপাদন শুরু করল বেঙ্গল কেমিক্যাল। কিন্তু বিদেশি ওষুধকে সরিয়ে নিজের জায়গা করে নিতে বেঙ্গল কেমিক্যালকে অনেক বেগ পেতে হল। প্রফুল্লচন্দ্রের আন্তরিক ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে জন সাধারণের মনে স্থায়ী আসন তৈরি করল বাঙালি প্রতিষ্ঠানটি।

১৮৯২ সালের ৮০০ টাকা মূলধন বেড়ে ১৮৯৪ সালে ৩০০০ টাকা এবং ১৯০১ সালে ২৩৫০০ টাকায় পৌঁছল। ১৯০৫ সালে বাগমারীতে মানিকতলা খালের কাছে একটি ১০ বিঘা জমি কেনা হল এবং কারখানা উঠে এল নতুন স্থানে। ইতিমধ্যে ১৯০৪ সালে বেঙ্গল কেমিক্যালে যোগ দিয়েছেন রাজশেখর বসু। তারও আগে মূলধনের প্রয়োজন বুঝে প্রফুল্লচন্দ্র ১৯০১ সালে বেঙ্গল কেমিক্যালকে 'পাবলিক

লিমিটেড' করে দিয়েছিলেন। সংস্থাটি দেশী গাছগাছড়া থেকেও ওষুধ তৈরি শুরু করেছিল। বাসকের সিরাপ, যোয়ানের আরক জনপ্রিয় হল বাজারে। সালফিউরিক অ্যাসিড, চা-পাতা থেকে ক্যাফেন, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, রাসায়নিক তুলা, ন্যাপথালিন, ব্লিচিং পাউডার এবং অন্যান্য বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি হত। পানিহাটিতে ১৩৩ বিঘা জমির ওপর নতুন শাখা খোলা হল। অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে আলকাতরা পাতনের মধ্যদিয়ে রঙ, নানাবিধ ওষুধ ও রাসায়নিক তৈরি হতে লাগল। প্রচুর পরিমাণে ফটকিরি উৎপাদন শুরু হল। ১৯৩৪ সালে মুম্বাইতে স্থাপিত হল একটি শাখা কারখানা। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যাপক পরিমাণে রাসায়নিক দ্রব্যের চাহিদা বেঙ্গল কেমিক্যালের উন্নতির পথ অনেকাংশে সুগম করে দিল। সব মিলিয়ে পূর্ব ভারতে সাধারণ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অন্যতম উৎস হয়ে দাঁড়াল বেঙ্গল কেমিক্যাল।

এক সময়ে বেঙ্গল কেমিক্যালের গৌরবময় একটি দিক ছিল অ্যান্টিভেনাম সিরামের ভায়াল তৈরি। ২০০৫ সালেও সেখানে প্রায় ৫১ হাজারের বেশি ভায়াল তৈরি হয়েছিল। ২০০৬ সাল থেকে পরিকাঠামোর অভাবে বন্ধ হয়ে যায় এই প্রকল্প। আজ তাই পশ্চিমবঙ্গকে সর্প দংশন প্রতিষেধকের জন্য গুজরাটের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে হয়। মানিকতলায় আজও অপ্রয়োজনীয় হয়ে অকারণে পড়ে থাকে একসময়ে এই কাজে ব্যবহৃত ৩০টি ঘোড়া। পরিকাঠামো গত

অগ্রগতি আজও সহজেই এই রাজ্যকে অ্যান্টিভেনাস উৎপাদনে স্বনির্ভর করে তুলতে পারে। শুধু চাই একটু দূরদৃষ্টি, তৎপরতা এবং আন্তরিকতা।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'প্রেম রসায়নে ওগো সর্বজন প্রিয়,/ করিলে বিশ্বের জনে আপন আত্মীয়।' একথা সত্য। একসময়ে সমগ্র বাঙালি সমাজ ছিল প্রফুল্লচন্দ্রের আত্মীয়। যে মানুষটির যাত্রা একদিন শুরু হয়েছিল রসায়নের রহস্যভেদের মধ্য দিয়ে, তিনিই রচনা করেছিলেন ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কে এক নতুন মাত্রা, শিল্পায়নে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন বাঙালি মানসকে, জাতপাত-অস্পৃশ্যতার ভ্রূকুটি দূর করে বাঙালি সমাজকে করতে চেয়েছিলেন কলুষমুক্ত। ১৯৪৩ সালের ১৬ জুন প্রফুল্লচন্দ্রের মৃত্যুর পরে সত্তর অধিক বছর কেটে গেছে। কিন্তু সেই মহাপ্রাণ মানুষটির স্মৃতিকে সঠিকভাবে ধরে রাখতে আমরা কি করে উঠতে পেরেছি? জগদীশচন্দ্র ও মেঘনাদ সাহার নামে তবু দুটি গবেষণা ক্ষেত্র রয়েছে। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো তেমন কোনো উদ্যোগ কেন্দ্র বা রাজ্যস্তরে আমরা দেখিনি। উল্টে তাঁর স্বপ্নের বেঙ্গল কেমিক্যাল যা প্রফুল্লচন্দ্রের অনেক আত্মত্যাগ ও দূরদর্শীতার ফসল তাও হারিয়ে যেতে চলেছে কালের গর্ভে।

ভুললে চলবে না, বেঙ্গল কেমিক্যাল শুধু প্রফুল্লচন্দ্রের স্বপ্ন ছিল না, এ ছিল একটি পরাধীন জাতির স্বপ্ন, এক মহান উত্তরণের ইতিহাস। ইদানিংকালে সংস্থাটির আর্থিক অবস্থা ভালো যাচ্ছিল না। বিগত কয়েক দশক ধরে লাগাতার লোকসানে চলার পর ২০১৬-১৭ সালে সংস্থাটি প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা লাভের মুখ দেখে। অ থচ সংস্থাটির ঋণের বোঝা কমানোর জন্য ২০১৬ সালের ২৮ ডিসেম্বর এর অপ্রয়োজনীয়

সম্পত্তি বিক্রির একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। যাইহোক সেই বিক্রয়কে ঠেকাতে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে সেখানকার শ্রমিক সংগঠন। তাই বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত আপাতত স্থগিতাদেশ পেয়েছে।

আজ যখন আমরা বাংলাকে বিশ্ববাংলা করে তোলার কথা ভাবছি, বাঙালির এগিয়ে চলার স্বপ্ন দেখছি তখন প্রফুল্লচন্দ্রের ভাবনা ও ভাবধারাকে ভুলে গেলে চলবে না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বপ্নের 'বেঙ্গল কেমিক্যাল'কেও ফিরিয়ে আনতে হবে স্বমহিমায়। এক্ষেত্রে সংস্থাটির বাড়তি জমিতে যদি প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শকে অনুসরণ করে কোনো গবেষণা ক্ষেত্র তাঁর নামে গড়ে তোলা যায় তাহলে সেই পরম শ্রদ্ধেয় মানুষটির প্রতি কিছুটা সুবিচার করা হবে।

E.mail.rajdip5678@gmail.com • M : 9836569850

উড়ানের শুরুর দিকে

সম্রাট সরকার

পাখির ওড়ার অনেক ধাপ আছে। প্রথমত, মাটি থেকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করে শূন্যে ওঠা বা Take Off। দ্বিতীয়ত, শূন্যে স্থির হয়ে থাকা বা Hovering। যেমন মাছরাঙা বা হামিংবার্ডের শূন্যে ভেসে থাকা। তৃতীয়ত, ডানা দুটি স্থির ভাবে দুপাশে ছড়িয়ে ভেসে যাওয়া বা Gliding/Soaring। চতুর্থত, সাধারণ ভাবে ওড়া বা Flapping Flight। পঞ্চমত, মাটিতে নেমে আসা বা Landing। এখানে শুধুমাত্র Take Off নিয়ে কথা বলব। Take off হল পাখির ওড়ার প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। কারণ বিপদের সময় একটি ভালো take off তার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে। পাখি বিভিন্ন জায়গা থেকে ওড়া শুরু করতে পারে বা Take off করে। যেমন হাঁস, পানকৌরী জলতল থেকে। ডাহুক, সাদা কাঁক জলে ভাসমান কচুরিপানা থেকে এবং অন্যান্য পাখি গাছের ডাল বা বড় পাথর বা সেই রকম কোনো শক্তপোক্ত জায়গা থেকে। আবার সময় অনুযায়ী তাদের Take off-এর ধরন পাল্টে যেতে পারে। যেমন— বিপদের সময় তাড়াতাড়ি উচ্চতায় পৌঁছতে বা ধীরে-সুস্থে ওড়া শুরু করতে Take off-এর কৌশল পরিবর্তিত হয়।

এখন ছবিতে দেখানো তিনটি পাখির Take off নিয়ে আলোচনা করা যাক।

১. সাদা কাঁক বা Grey Heron—লক্ষ করে দেখবেন পাখিটি জলের ভাসমান কচুরিপানা ও ঘাসের ওপর থেকে Take off করছে। পাখি চটজলদি শরীরকে শূন্যে ছুঁড়ে দিতে পা দুটিকে অবশ্যই ব্যবহার করে। কিন্তু নীচের মাটি যথেষ্ট শক্ত না হওয়ায় প্রথমে সে ডানা নীচের দিকে সজোরে ঝাপটায় বা Down stroke দেয়। ডানার নীচে বাতাসের উর্ধমুখী চাপ তাকে মাটি থেকে উপরে তুলে দেয়।

২. বড় ধনেশ বা Great Indian Hornbill— এই পাখিটার ক্ষেত্রে পরিষ্কার যে Take off-এর সময় তারা পা ব্যবহার করে। শুকনো গাছের ডালের ওপর সজোরে চাপ দিয়ে দেহ শুন্যে ভাসিয়ে দেয়। পায়ের জোরে সে কিছুটা সামনের দিকে এগিয়েও যেতে পারে। তারপর ডানা ছড়িয়ে উড়ান চালিয়ে যাওয়া।

৩. মাছমরাল বা Osprey—ছবিতে পাখিটা একটি নড়বড়ে বাঁশের ওপর থেকে উড়ান শুরু করছে। দ্রুত তার শুন্যে উঠে যাওয়ার প্রয়োজন কম। তাই প্রথমেই ডানার Up Stroke। তারপর ভেসে থাকার জন্য লম্বা Down Stroke।

যদিও ছবি থেকে Take off সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট ধারনা তৈরি করে না নেওয়াই ভালো। তবু এটা পরিষ্কার যে Take off-এর সময় পাখি পা এবং ডানা, দুটিরই সমান ব্যবহার করে।

E.mail.samratswagata11@gmail.com • M : 9433962227

মৃগী রোগ

ড. অনিন্দিতা জোয়ারদার

১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক গেমস্-এ একটি আমেরিকান মেয়ে দৌড় প্রতিযোগিতায় ৩টে সোনা ও ১টি রুপোর পদক পেয়ে সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিল। মেয়েটির নাম ফ্লোরেন্স ডেলোরেজ গ্রিফিথ জয়নার। তাঁকে বলা হয় পৃথিবীর সর্বকালের সব থেকে দ্রুতগামী মহিলা। তাঁর গড়া রেকর্ড এখনও অক্ষত রয়েছে। ইনি ফ্লো জো নামে বেশি বিখ্যাত। এহেন একজন অ্যাথলিট ১৯৯৮ সালে মাত্র ৩৮ বছর বয়সে ঘুমের ঘোরে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর কারণ ছিল ঘুমের মধ্যে হঠাৎ মৃগীর খিঁচুনি হয়ে শ্বাসরোধ হওয়া। ওনার চিকিৎসা চলছিল, কিন্তু তবুও উনি এই অসুখটির শিকার হলেন। তবে এমন অনেক মানুষের উদাহরণ আছে যাঁরা মৃগীর অসুখে আক্রান্ত হয়েও, নিজেদের প্রতিভার জোরে গোটা পৃথিবীকে জয় করেছেন, যেমন চার্লস ডিকেন্স, ভান গঘ, নেপোলিয়ান, দস্তয়ভেস্কি, আলফ্রেড নোবেল, আলেকজান্ডার, জোয়ান অফ আর্ক প্রমুখ।

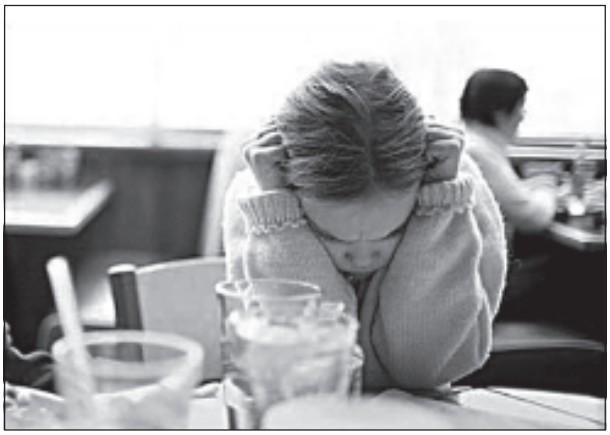

মৃগীরোগ বা এপিলেপ্সি কথাটা একটি প্রাচীন গ্রিক শব্দ 'এপিলেপ্সিয়া' থেকে এসেছে। প্রাচীন সময়ে এই অসুখটির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল ভর হওয়া বা ভর আসার মতো কিছু ধর্মীয় ঘটনা। এপিলেপ্সিয়া কথাটির অর্থ হল কোনো কিছুকে জাপটে ধরা বা খুব জোরে আঁকড়ানো। এই অসুখটিকে অনেক সময় 'পবিত্র অসুখ' বলা হত। কারণ, ধারণা করা হত যে, এপিলেপ্সির সময় হওয়া কাঁপুনিগুলি আসলে ভগবানের পাঠানো সংবাদ। পরবর্তীকালে বিভিন্ন জাতির এবং দেশের মানুষদের মধ্যে এই 'ফিট' হওয়া রোগীকে একঘরে করে বন্দি করা হতে থাকে। মানুষের অন্ধবিশ্বাসের জেরে, তানজানিয়ায় 'ফিট' হওয়ার সঙ্গে ভূতের ভর হওয়া এবং ডাইনিতে রূপান্তরিত হওয়া কিংবা বিষক্রিয়া হওয়া যুক্ত হয়। ভারতবর্ষে আজকের দিনেও 'ফিট' হওয়াকে ছোঁয়াচে বলে অনেক মানুষই ভাবেন।

এই ধরনের অন্ধবিশ্বাস কিছু মানুষের মধ্যে থাকলেও, অনেকেই আজকাল এই বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসছেন। হিপোক্রেট্স (খ্রিস্টপূর্ব ৪৬০-৩৭০) অনেকদিন আগেই বলেছিলেন যে, 'এপিলেপ্সি'-কে যেদিন মানুষ ঠিক করে বুঝতে শিখবে, সেদিন থেকে এটি আর 'পবিত্র অসুখ' থাকবে না।

এপিলেপ্সি একটি দীর্ঘকালীন স্নায়ুরোগ যাতে করে কাঁপুনি হয়। গোটা পৃথিবীতে প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ এই রোগে আক্রান্ত। মৃগীরোগ ছোটো বাচ্চাদের এবং ৬৫ বছরের উপর যাদের বয়স, তাদের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে আবার এপিলেপ্সি বিভিন্ন কারণে যে কোনো মানুষের যে কোনোও সময়ে হতে পারে। যেমন, মস্তিষ্কে সার্জারির পর এই অসুখটি হঠাৎ হতে পারে। মৃগীরোগ ওষুধ দিয়ে একেবারে সারিয়ে দেওয়া হয়তো যায় না, কিন্তু নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। দেখা গেছে মাত্র ৩০ শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে ওষুধ প্রয়োগেও কোনোভাবেই অসুখটিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। কোনো কোনো ধরনের মৃগীরোগ জীবনের বিশেষ একটি সময়ে হয়। যেমন ছেলেবেলায় এই অসুখটি থাকলেও, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর প্রকোপ কমে যায়। প্রায় ৪০ ধরনের এপিলেপ্সি রয়েছে। মস্তিষ্কের কোন জায়গায় অসুবিধের জন্য এই কাঁপুনি হচ্ছে, তার ভিত্তিতে এর কিছু ভাগ করা হয়েছে। কিছু এপিলেপ্সি জিনগত ত্রুটির কারণে হয়, আবার লক্ষণজনিত কোনো টিউমার বা ক্ষত অথবা লুক্কায়িত কোনো ক্ষতর জন্যও এই অসুখটি দেখা দিতে পারে।

আগেই বলেছি যে, বিভিন্ন জিনের মিউটেশন বা ত্রুটিকে এই রোগটির জন্য অনেকাংশেই দায়ী করা হয়। স্নায়ুকোশের বার্তা সংবহনের জন্য কিছু সোডিয়াম চ্যানেল আছে। এগুলি আয়নের পরিবর্তনের জন্য খোলে বা বন্ধ হয় (ভোল্টেজ গেটেড), অথবা কোনো লাইগ্যান্ড যুক্ত হলেও খোলে বা বন্ধ হয় (লাইগ্যান্ড গেটেড)। সাধারণভাবে এই চ্যানেলগুলি বন্ধ থাকে। এই চ্যানেলগুলির কার্যকলাপের জন্য যে জিনগুলি দায়ী, সেগুলিতেই মিউটেশনের ফলে এই চ্যানেলগুলি ঠিকমতো কাজ করতে পারে না। মিউটেশন হলে এই সোডিয়াম চ্যানেলগুলি অনেকক্ষণ খোলা থাকে, যার ফলে গ্লুটামেট ধরনের নিউরোট্রান্সমিটার কোশ থেকে নির্গত হতে থাকে। এগুলি অন্যান্য নিউরোনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, অতিরিক্ত ক্যালশিয়াম বের করতে থাকে। যে কারণে নিউরোনগুলি অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ে ও খিঁচুনি হতে থাকে। অতিরিক্ত ক্যালশিয়াম কোশের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে থাকে। ঠিক একইভাবে অনেকক্ষণ ধরে লাইগ্যান্ড যুক্ত হয়ে থাকলে চ্যানেলগুলি অনেকক্ষণ ধরে খোলা থেকে যায়।

যদি এপিলেপ্সির জিনগত কারণ সুস্পষ্ট হয়, তাহলে এর অনেক উপকারিতা আছে। যেমন, বংশের মধ্যে আক্রান্তদের সহজেই চিহ্নিত করে চিকিৎসা করা যায়। গত কয়েক দশক থেকে এই অসুখটি নিয়ে গবেষণা অনেক দূর এগিয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে যে খুব শীঘ্রই নতুন কিছু ওষুধ বা চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার হবে, যা হবে প্রতিটি আক্রান্ত মানুষের জন্য নিজস্ব বা ব্যক্তিগত।

M : 9830428638

জাতকের গল্প

নির্মাল্য দাশগুপ্ত

টুকান, টুবাই আর টুকলদের আব্দারে মাঝে মাঝেই গল্প তো বলতেই হয়—কাজেই অফিস থেকে এসে সেদিন একটু বিশ্রাম নেওয়ার ফাঁকেই শুরু করলাম গল্প— 'এক যে ছিল রাজা যিনি ছিলেন ধর্মভীরু। তার নাম ব্রহ্মদত্ত। সবেতেই ভয় পেতেন। আর এই ভয়কে কাজে লাগিয়ে পুরোহিতরাও কিছু রোজগার করে নিতেন।

সেদিন মাঝরাতে রাজা প্রথমে বাদুড়, তারপর কাক, এইভাবে গরু, কোকিল, বানর, হরিণ, ঘোড়ার চিৎকার ও একটি মানুষের গান শুনতে পেলেন। রাজার খুবই ভাবনা হল। পরদিন রাজা পুরোহিতদের কাছে এর ব্যাখ্যা শুনতে চাইলেন।

রাজপুরোহিত মাথা নেড়ে বললেন, 'অশুভ বিষয়। আপনাকে এক মাস যজ্ঞ করে এক হাজার পশু বলি দিয়ে পাপমুক্ত হতে হবে।'

রাজা সম্মতি দিলে যজ্ঞের আয়োজন শুরু হল। কিন্তু রাজপুরোহিতের এক শিষ্য বললেন, 'গুরুদেব, কেন রাজার অপব্যয় করাচ্ছেন। রাতে রাজা আটটি প্রাণীর কণ্ঠস্বর শুনেছেন। এর কোনো ব্যাখ্যা তো শাস্ত্রে নেই।'

পুরোহিত বললেন, 'আছে। সে শাস্ত্রের নাম স্বার্থশাস্ত্র। মাঝে মাঝে আমাদের প্রাপ্তিযোগ হয় সেই শাস্ত্রের মাধ্যমে। তুমি যখন সংসারী হবে, তখন বুঝতে পারবে।'

'এ তো ধর্মের নামে বুজরুকি। এর মধ্যে আমি নেই।'

'কেন, এত পুজা-অর্চনা-এর ফলেও তো রাজার পূণ্য হবে।

'ভালো কথা, কিন্তু আমি চললাম।' শিষ্য বিদায় নিল। পথে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হলে তাকে প্রণাম করে শিষ্য সব কথা বলে পরামর্শ চাইল। বলল, আপনি সন্ন্যাসী। আপনি এই স্বার্থশাস্ত্রের ব্যাপারটা রাজাকে বলুন। যজ্ঞে এক হাজার পশু বলি হবে ভাবলেই আমার খারাপ লাগে।'

সন্ন্যাসী বললেন, 'রাজা নিজে যদি আমায় জিজ্ঞাসা করেন, তখন বলতে পারি।'

শিষ্য রাজার সঙ্গে দেখা করে জানালো, 'বাগানে এক সাধু এসেছেন, মহারাজ, আপনি তাঁকেও এই বিষয়টা জানাতে পারেন।'

রাজা বাগানে গিয়ে সাধুকে প্রণাম করে এসবের অর্থ জানতে চাইলেন।

সাধু বললেন, 'অর্থ আছে। বাদুড় বলছে রাজার বাগানের গাছগুলি জাল দিয়ে ঢাকা থাকলে তারা খাবার পাবে না।'

'দ্বিতীয়ত কাকের কথা হল যে তার বাসা আছে রাজতোরণের উপর। রাজহস্তী যখন তোরণ পার হয় ঠিক তখনই মাহুত অঙ্কুশ দিয়ে আঘাত করে ডিমগুলি ফেলে দেয়। তাই কাক বলছিল— এ রাজ্যে কি বিচার নেই?'

এরপর গোরু বলছিল, আমায় সব দুধ রাখাল এমনভাবে দুয়ে নেয় যে বাছুরটা একটুও দুধ পায় না। রাজার এত গরুর দুধেও পেট ভরে না?

আপনারই পোষা কোকিল বলছিল, আমায় রাজা বন্দি করে আমার কান্না শুনে ভাবেন আমি গান গাইছি। আমায় ছেড়ে দিলে আমি বনে চলে যাই।

এবার হরিণের কথা। সে বলছে আমি বনের মধ্যে সুখে ছিলাম। বাঘের ভয় থাকলেও সেখানে আমার বন্ধুরা ছিল। পাহাড় ছিল, ঝরণা ছিল, মুক্তি ছিল, এমন বেড়া ছিল না।

বানর বলছে, আমি রাজার কোনো ক্ষতি না করলেও রাজা আমায় বেঁধে রেখেছেন। সপ্তমে শুনেছেন ঘোড়ার ডাক। সে বলছিল, সহিস আমার দানা চুরি করে, আমি ভালো করে খেতে পাই না। দুর্বল হয়ে জোরে ছুটতে পারি না। সবার শেষে আমি গান গাইতে গাইতে ফিরছিলাম। বলছিলাম, দুষ্টু ও লোভীদের হাত থেকে রাজাকে রক্ষা করুন।

এই ব্যাখ্যা শুনে রাজা অবাক হলেন। বললেন, 'তাহলে আমার কী করা উচিত?'

ভালো করে চিন্তা করে বিচার-বিবেচনা করে আপনিই সিদ্ধান্ত নিন কী করা উচিত? যাতে কারও ক্ষতি না হয় সেটা দেখুন। কাকের ডিম না ভাঙে। বাছুরেরা যেন দুধ পায়। কোকিল, বানর, হরিণকে ছেড়ে দিন। ঘোড়ার দানা চুরি ও চাবুক মারা বন্ধ করুন। আর যজ্ঞে বলি দেবার জন্য যে সব পশু এনেছেন, তাদের ছেড়ে দিন। যজ্ঞ বন্ধ করে তার অর্থ দিয়ে আতুর-শালা প্রতিষ্ঠা করুন। সত্যিকারের ভালো কাজ বলে যা মনে হয় তাই-ই করুন।

রাজা সব বুঝে যজ্ঞ বন্ধ করে দিলেন। ফলে অকারণ ভয় থেকে তিনি মুক্ত হলেন।

M : 9143889823

অঙ্ক দিয়ে মিষ্টি ভাগ

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

মিতা, বুম্বাই আর নন্টে তিন ভাই বোন। এটা ওটা নিয়ে ওদের মধ্যে খুনসুটি লেগেই আছে। সেদিন স্কুল থেকে ফিরে ওরা বায়না ধরল, মিষ্টি খাবে। মা বললেন, মিতা আর বুম্বাই রসগোল্লা আর পান্তুয়া চেয়েছে দেখে নন্টেও বলে দিল তারও দুটো পান্তুয়া চাই। মিষ্টি দিতে গিয়ে দেখা গেল পাত্রে তিনটে রসগোল্লা আর তিনটে পান্তুয়া আছে। মিতাকে দুটো রসগোল্লা এবং বুম্বাকে দুটো পান্তুয়া দেওয়ার পর নন্টের ভাগে জুটছে একটা রসগোল্লা ও একটা পান্তুয়া। একথা শুনে নন্টে তো ভীষণ চটে গেছে। দুটো পান্তুয়া না হলে সে খাবেই না। বুম্বাইও নাছোড়বান্দা। সেও তার ভাগের দুটো পান্তুয়া কিছুতেই ছাড়বে না। এই নিয়ে দু'ভাই শুরু করে দিয়েছে তুলকালাম। সেই সময় আমি ওদের বাড়িতে যেতেই সবাই এসে আমাকে অভিযোগ জানাতে শুরু করল। অভিযোগ শুনে ওদের তিনজনকে বললাম, আমি একটা ছোট্ট অঙ্ক দেব। যে অঙ্কটার উত্তর সঠিক বলতে পারবে তার কথা অনুযায়ী মিষ্টি ভাগ হবে। এই কথা শুনে তিনজনেই রাজি হয়ে গেল।

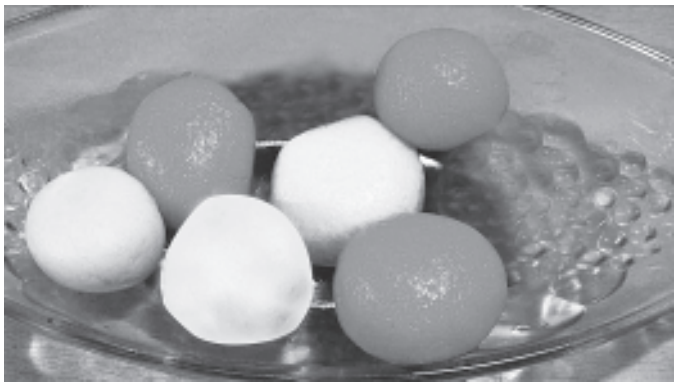

এবারে আমি কী করলাম শোন। একই রকম দেখতে তিনটে বাটি নিলাম এবং ওদের তিনজনকে না দেখিয়ে প্রত্যেক বাটিতে দুটো করে মিষ্টি রাখলাম। একটায় রাখলাম দুটো রসগোল্লা, একটায় দুটো পান্তুয়া এবং আরেকটায় একটা রসগোল্লা এবং একটা পান্তুয়া। এবার তিনটে বাটিতেই তিন রঙের তিনটে ঢাকা দিয়ে দিলাম যাতে বাটির ভিতরে কোনটায় কী আছে দেখা না যায়। একটা বাটিতে দিলাম সাদা রঙের ঢাকা, আরেকটায় দিলাম বাদামী রঙের ঢাকা এবং তৃতীয়টায় দিলাম রঙবেরঙের ঢাকা। এবার মিতা, বুম্বাই এবং নন্টেকে ডেকে বললাম তিনটে বাটির একটাতে দুটো রসগোল্লা, একটাতে দুটো পান্তুয়া রাখা হয়নি। যে কোনো একটা বাটির ঢাকা একটু ফাঁক করে না দেখে একটা মিষ্টি তুলে নিয়ে মিষ্টিটা দেখে বলতে হবে কোন বাটিতে কোন মিষ্টি আছে। প্রশ্ন শুনে মিতা আর বুম্বাই মাথায় হাত দিলেও নন্টে কিন্তু বলে দিয়েছিল কোন বাটিতে কী ধরনের মিষ্টি রাখা ছিল। নন্টে সঠিক উত্তর দেওয়ায় প্রথমে আমি একটু অবাক হয়েছিলাম। পরে মনে পড়েছিল যে বেশ কিছুদিন আগে নন্টে এই ধরনের একটা খেলা আমার কাছ থেকে শিখেছিল। শর্ত অনুযায়ী নন্টে মিষ্টি ভাগ করার দায়িত্ব পেল। সবাই ভেবেছিল ও দুটো পান্তুয়া রাখা বাটিটা নেবে। কিন্তু তা করেনি। দাদাকে সেটা এগিয়ে দিয়ে নিজে একটা রসগোল্লা ও একটা পান্তুয়া খেয়ে ছিল। অনেকেই হয়তো ভেবেছেন নন্টে কীভাবে উত্তরটা দিয়েছিল?

নন্টে রঙবেরঙের ঢাকা দেওয়া বাটি থেকে একটা মিষ্টি নিয়েছিল। এবারে শর্ত অনুযায়ী কী কী হতে পারে দেখে নেওয়া যাক।

১) নন্টে যে মিষ্টিটা তুলেছিল সেটা পান্তুয়া হতে পারে।

অথবা

২) নন্টে যে মিষ্টিটা তুলেছিল সেটা রসগোল্লা হতে পারে।

এখন শর্তানুযায়ী রঙবেরঙের ঢাকা দেওয়া বাটিতে একটা রসগোল্লা ও একটা পান্তুয়া থাকতে পারে না। তাহলে বাটিতে হয় দুটো রসগোল্লা নতুবা দুটো পান্তুয়া ছিল। নন্টের হাতে যদি পান্তুয়া ওঠে তবে ওই বাটিতে আরও একটা পান্তুয়া ছিল। অতএব রঙবেরঙের ঢাকা দেওয়া বাটিতে দুটো পান্তুয়া ছিল। এবার বাকি দুটো বাটির একটাতে ছিল দুটো রসগোল্লা এবং আরেকটাতে ছিল একটা রসগোল্লা ও একটা পান্তুয়া। এখন শর্ত অনুসারে সাদা ঢাকা দেওয়া বাটিতে দুটো রসগোল্লা থাকতে পারে না। অতএব বাদামী ঢাকা দেওয়া বাটিতে দুটো রসগোল্লা এবং সাদা ঢাকা দেওয়া বাটিতে একটা রসগোল্লা ও একটা পান্তুয়া ছিল। এখন প্রথমেই যদি নন্টের পাতে রসগোল্লা ওঠে তবে রঙবেরঙের ঢাকা দেওয়া বাটিতে দুটো রসগোল্লা থাকবে। তাহলে অপর দুটো বাটির একটাতে থাকবে দুটো পান্তুয়া এবং অপরটাতে থাকবে একটা রসগোল্লা ও একটা পান্তুয়া। এখন শর্ত অনুযায়ী বাদামী ঢাকা দেওয়া বাটিতে দুটো পান্তুয়া থাকতে পারে না। অতএব সাদা ঢাকা দেওয়া বাটিতে থাকবে দুটো পান্তুয়া এবং বাদামী রঙের ঢাকা দেওয়া বাটিতে থাকবে একটা রসগোল্লা ও একটা পান্তুয়া।

E.mail.kbb.scwriter@gmail.com • M : 9433145112

জ্ঞানীদিদি

অনুলিখন : ডাঃ সিদ্ধার্থ জোয়ারদার

অঙ্কণ : জুয়েল হালদার

সংবাদ

একটি সাপে কাটা ঘটনা

৯ জুলাই, ২০১৭ রবিবার সন্ধ্যায় হঠাৎ ডাঃ পরিক্ষীত ভট্টাচার্য ফোন করলেন অমিতাভদার মোবাইলে। কিছুক্ষণ কথা হওয়ার পর ফোন রেখে অমিতাভদা বললেন, যাবে নাকি এম জে এন হসপিটালে? একটা snake bite-এর patient এসেছে। সাথে সাথেই আমরা ছুটলাম সেই উদ্দেশ্যে। পৌঁছে গিয়ে দেখি ডাঃ ভট্টাচার্য আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। উনি আমাদের নিয়ে সোজা শিশু বিভাগে চলে এলেন। প্রথমেই প্রত্যক্ষ করলাম এক সাপে কাটা মানুষ এবং সেও বছর সাতেকের একটি ছেলে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলাম। এর মধ্যেই কানে ভেসে এল ডাক্তারবাবুর কথাগুলি "চল্লিশখানা A.V.S. লিখেছি, already ৩০ ভায়াল নেওয়া হয়ে গেছে। সঙ্গে neostigmine, কিন্তু খুব বেশি response দেখছি না।" তারপর উনি সেই রোগীকে পর্যবেক্ষণ করতে করতে নার্সকে বললেন, "পরের ১০টি ডায়ালও দিয়ে দিন।" আমরা দেখলাম অর্ধচেতন অবস্থায় ছেলেটির তখনো খিঁচুনি চলছে। চারজন লোক ওকে বিছানার সাথে ধরে রাখতে পারছে না। আমরা জানতে চাইলাম কোন প্রজাতির সাপ কামড়েছে? ডাক্তারবাবু ক্ষতস্থানের edmia (ফোলাভাব) দেখিয়ে নিশ্চিতভাবে বললেন, "krait" প্রজাতির কোনো সাপ, যার বিষ neurotoxic (স্নায়ুতন্ত্রের উপর বিষের প্রভাব কার্যকরী)। স্যালাইন ও অক্সিজেন চলছে। সাথে অ্যান্টি-এলার্জিক ইঞ্জেকশান। যদি respiratory failure না হয় তবে বাঁচানো যাবে। কিন্তু ৩৬ ঘন্টা না গেলে কিছুই বলা যাবে না।" সেই রাতে ছেলেটিকে I.C.U.-তে স্থানান্তরিত করা হলো। সেখানেই চলল পর্যবেক্ষণ ও চিকিৎসা। অবশেষে দিন চারেক পর দাদার মোবাইলে একটি ভিডিওতে দেখলাম ছেলেটি বলছে সে এখন সুস্থ। তার নাম চন্দন দাস। বাড়ি কোচবিহারের খাপাইডাঙ্গা এলাকায়। ঘরের ভেতরে তাকে সাপ কামড়েছিল। শুনলাম ছেলেটিকে বাঁচানোর জন্য সেদিন তাকে চল্লিশটি A.V.S. vial-ই দিতে হয়েছিল। এই ভাবে বিজ্ঞানের এক আবিষ্কার এবং একজন ডাক্তারের কর্তব্যপরায়ণতা ফিরিয়ে দিল কিশোর চন্দন দাসের প্রাণ। আমরা প্রত্যক্ষদর্শী রইলাম।

প্রতিবেদিক : সুমিতা সাহা, কোচবিহার • *M : 9547543367*

হিরোসিমা দিবস

৬ আগস্ট বেরিয়ে পড়ি ও বিজ্ঞান দরবারের যৌথ ব্যবস্থাপনায় হালিশহর রামপ্রসাদ বিদ্যাপিঠ হাইস্কুলে পরিবেশ ও বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ, বক্তৃতা, ও আলোকচিত্রসহ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বিলুপ্তির পথে জীববৈচিত্র্য শীর্ষক আলোকচিত্র বক্তব্য রাখেন শ্রী দ্বীজেন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হালিশহর অঞ্চলের বিভিন্ন পাখির ছবি দেখিয়ে আলোচনা করেন পরিবেশকর্মী তাপস কুমার দত্ত। অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান বিষয়ক পুরস্কার দেওয়া হয়।

প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে সম্মেলন

২০ আগস্ট চাকদহ রবীন্দ্র সভাকক্ষে সারাদিন ব্যাপী প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে বিজ্ঞান সংগঠনগুলির এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৪০টি বিজ্ঞান সংগঠনের প্রায় ১৫০ বিজ্ঞানকর্মী আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে শব্দবাজি ও ডি.জে. সাউন্ড এর বিরুদ্ধে সারাক্ষণ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

২য় পর্যায়ে পরিবেশ, জলাশয় ও বনভূমি সংরক্ষণ নিয়ে পরিবেশকর্মীরা দীর্ঘ আলোচনা করেন। নদী ও জলাশয়ের সংস্কারের দাবি ও পাশাপাশি জলাশয় সংরক্ষণ ও জলাশয় বাঁচানোর জন্য আইনি ব্যবস্থাগুলির ওপর জোড় দিতে হবে। সম্মেলনে ৩০ জনের একটি প্রস্তুতি কমিটি তৈরি করা হয়। সম্মেলনে প্রকাশ দাসবিশ্বাস এর লেখা 'যেন ভুলে না যাই' এবং ডা. সিদ্ধার্থ জোয়ারদার ও ড. অনিন্দিতা জোয়ারদার-এর লেখা 'আধুনিক জীববিদ্যা ও জনস্বাস্থ্যের সহজপাঠ' শীর্ষক দুটি বই প্রকাশিত হয়।

পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়ছে

পরমাণু বিদ্যুতের বিরুদ্ধে পরিবেশ কর্মীরা সারা বিশ্বজুড়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। মূলত পরিবেশ দূষণ ও খরচও প্রায় তিন গুণ। সারা পৃথিবী জুড়ে বিকল্প ও পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তির উৎসগুলির (যথা জল, বাতাস, বায়োগ্যাস, সূর্য, সমুদ্রের তাপ) ভান্ডার অফুরন্ত।

সম্প্রতি ব্রিটেনে বায়ুশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়াতে চলেছে। পাশাপাশি বায়ুশক্তি ব্যবহার করে যে বিদ্যুৎ তৈরি হবে, তার খরচও অনেক কম। গ্রিন পার্টির সমর্থকরা জানিয়েছেন এর ফলে পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তির ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করবে এবং ভবিষ্যতে এই শক্তির দাম আরও অনেক কমবে। পাশাপাশি পরিবেশ দূষণও হ্রাস পাবে। রিপোর্টে জানা যায় যে, ভারতেও পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়ছে।

জানো কি?

বিজয় সরকার

❑ সূর্যমুখী ফুল কেন সব সময় সূর্যের পানে চেয়ে থাকে?

যতক্ষণ আকাশে সূর্য, সূর্যমুখী ফুলও সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে। সমগ্র উদ্ভিদ জগতের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা হল সূর্যর আলোতে সাড়া দেওয়া, যাকে বলা হয় ফোটোট্রপিজম। সূর্যমুখী ফুলের ক্ষেত্রে এই ফোটোট্রপিজমের কাজটি করে অক্সিন হরমোন। অক্সিন সরাসরি সূর্যালোক থেকে দূরে থাকে। ফলে অক্সিন সব সময় কাণ্ডের ছায়াছন্ন দিকে অবস্থান করে এবং সেখানে অক্সিন কোষের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে। এর ফলে কাণ্ডের বিস্তার ঘটে এবং তা বিপরীত দিকে অর্থাৎ সূর্যের দিকে ঝুকে পড়ে। কাণ্ডের উপর ছায়ার অবস্থান পরিবর্তন হলে অক্সিনও স্থান পরিবর্তন করে। এইভাবে সূর্যমুখী ফুল সবসময় সূর্যর দিকে মুখ করে থাকে।

❑ অংক করার সময় কোন অজ্ঞাত সংখ্যা প্রকাশে আমরা 'x' চিহ্নটি ব্যবহার করি কেন?

অংক, বিশেষ করে বীজগণিতের সমাধানে 'x' ধরে নেওয়াটা আমাদের সাধারণ প্রবণতা। চারশ বছর আগে ইওরোপে বীজগণিতের উপর অনেক বই লেখা হচ্ছিল। কিন্তু একজন লেখক জানছেন না অন্যান্য লেখকরা কি লিখছেন। সেই সময় বীজগণিতের সমাধানে প্রত্যেক গণিতবিদের নিজস্ব পদ্ধতি ছিল। ১৬৩৭ সালে, ফ্রান্সে দেকার্তের লেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশিত হয়। তিনি তাঁর অংকের সমাধানে অজ্ঞাত সংখ্যা বোঝাতে 'x', 'y' ও 'z' চিহ্নগুলি ব্যবহার করেন। দেখা গেল যে বইটির শেষ দিকে 'y' ও 'z'-এর ব্যবহার খুব কম হয়েছে। সেখানে 'x'-এর ব্যবহারই বেশি। সেই যুগে, ছাপাখানায় বই ছাপাতে যে যে অক্ষরগুলোর ব্যবহার বেশি হয়, সেগুলির ব্লক বেশি পরিমানে থাকত। আর ফ্রান্সে তখন ফরাসি ও ল্যাটিন ভাষায় বেশির ভাগ বই লেখা হত যেখানে 'y' ও 'z'-এর তুলনায় 'x'-এর ব্যবহার অনেক বেশি। ছাপাখানার যে কর্মীরা দেকার্তের বইয়ের টাইপ সেটিং করেছিলেন তারা বইয়ের প্রথমদিকেই সমস্ত 'y' ও 'z' ব্লক শেষ করে ফেলে। সম্ভবত তারা দেকার্তকে বলেছিলেন, যত বেশি সম্ভব 'x' ব্যবহার করে বইটিকে শেষ করতে। দেকার্তের বই দারুণ জনপ্রিয় হয়। এরপর থেকে অন্যান্য গণিতবিদ্‌গণও এই রীতি অনুসরণ করে অজ্ঞাত সংখ্যা প্রকাশে 'x' ব্যবহার করে বইটিকে শেষ করতে। দেকার্তের বই দারুণ জয়প্রিয় হয়। এরপর থেকে অন্যান্য গণিতবিদ্‌গণও এই রীতি অনুসরণ করে অজ্ঞাত সংখ্যা প্রকাশে 'x' চিহ্ন ব্যবহার করতে শুরু করেন।

❑ মাকড়সা নিজের জালে জড়ায় না কেন?

মাকড়সা জাল বোনে শিকার ধরার জন্য। জালটা হল মাকড়সার ফাঁদ। পোকামাকড় জালে পড়লেই জড়িয়ে পড়ে এবং মাকড়সার খাদ্য হয়। ওই একই জালে মাকড়সা কিন্তু স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করে, নিজে কখনও জালে জড়ায় না। এমন কেন হয়? এর উত্তর আছে মাকড়সার জাল বোনার রহস্যে।

মাকড়সা জাল বোনে দুরকম সুতোর সাহায্যে এবং দুইভাবে। প্রথমে তারা উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে তাদের পেটের সিল্ক গ্রন্থি থেকে রস বার করে। এরপর তাদের নিজস্ব বুনন যন্ত্রের সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে চারদিকে সাইকেলের স্পোকের মতো সুতোর টানা দেয়। কিছুক্ষণ পরেই ওই সুতো শুকিয়ে শক্ত ও মসৃণ রূপ নেয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে আর এক রকম সুতোর সাহায্যে আগের তৈরি সুতোর উপর বৃত্তাকারে জাল বুনতে শুরু করে। ওই সুতোগুলো আঠালো ও চটচটে যার ফলে শিকার এতে আটকে যায়। কিন্তু মাকড়সা যখন জালের উপর চলাফেরা করে তখন তারা শুকনো টানা সুতোগুলো দিয়ে যায়, বৃত্তাকার সুতোগুলো দিয়ে নয়। এছাড়া মাকড়সার পা থেকে এক ধরনের তেল বেরোয়, যার ফলে তারা নিজের জালে জড়িয়ে পড়ে না।

M : 9432335882

মহাকাশ বিজ্ঞানী ইউ আর রাও

রতন দেবনাথ

প্রশিক্ষক ইউ আর রাও

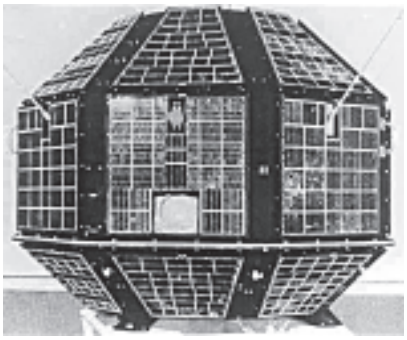

আর্যভট্ট

পি এস এল ভি রকেট

মহাকাশ প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে দেশের অগ্রগতির কথা প্রথম যিনি মাথায় এনেছিলেন তিনি মহাকাশ বিজ্ঞানী উদুপি রামচন্দ্র রাও। ইউ আর রাও নামেই যিনি বেশি পরিচিত। কৃষিক্ষেত্রে, যোগাযোগ ব্যবস্থায়, আবহাওয়া বিজ্ঞানে এমনকি প্রাকৃতিক সম্পদ সন্ধানে মহাকাশ প্রযুক্তির ব্যবহার যে অভাবনীয় ফল আনতে পারে তাও তাঁর মস্তিষ্ক প্রসূত। আজকের ভারতে উপরের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার সুফল প্রত্যেকেরই জানা।

উদুপি রামচন্দ্র রাও-এর জন্ম কর্নাটকের আদামারু গ্রামে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১০ই মার্চ। লক্ষ্মীনারায়ণ আচার্য এবং কৃষ্ণাবেণী আম্মার সন্তান, ভাবী মহাকাশ বিজ্ঞানী, গ্রামেই পাঠশালার পাঠ শেষ করে ভর্তি হন উদুপির খ্রিস্টীয় উচ্চ বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষে অনন্তপুরে গভর্নমেন্ট আর্টস এন্ড সায়েন্স কলেজে। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি শেষে আমেদাবাদে ফিজিকাল রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে ভারতের মহাকাশ গবেষণার জনক ডক্টর বিক্রম সরাভাই-এর অধীনে গবেষণা করে পিএইচ ডি ১৯৬০-এ।

পড়াশোনা শেষে ইউ আর রাও পাড়ি দিলেন বিদেশে। প্রথমে আমেরিকার মাসাচুসেটস্ ইনস্টিটিউট অফ টেক্নোলজি-তে ফ্যাকালটি মেম্বার হিসাবে এবং পরে টেক্সাস ইউনিভার্সিটিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে যোগ দেন। এখানে 'পাইওনিয়ার' এবং 'এক্সপ্লোরার' মহাকাশযানের মুখ্য ইনভেস্টিগেটার হিসাবে কাজ করেন। ১৯৬৬তে দেশে ফেরা। দেশে ফিরে আমেদাবাদে ফিজিকাল রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে প্রফেসার হিসাবে যোগদান করেন।

আমেদাবাদে ডক্টর বিক্রম সরাভাই-এর অধীনে রাও কসমিক রে নিয়ে কাজ শুরু করেন। মাসাচুসেটস্-এ থাকাকালীন সময়ে এ বিষয়ে তাঁর কাজের সুবাদে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সৌরঝঞ্ঝার প্রকৃতি এবং ভূ-চুম্বকের উপর তার প্রভাব প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু দেশের সার্বিক বিকাশে মহাকাশ প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে রাও ভারতে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রযুক্তির বিকাশের দিকে নজর দেন। সেটা ১৯৭২ সালের কথা। তাঁরই তত্ত্বাবধানে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে উৎক্ষেপিত হল ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 'আর্যভট্ট'। সেই শুরু। এরপর একাদিক্রমে ১৮টিরও বেশি উপগ্রহ উৎক্ষেপিত হয়েছে। যেমন, ভাস্কর, আপল, রোহিনী, ইনসাট-১, ইনসাট-২ ইত্যাদি বহুমুখী উপগ্রহ। এছাড়াও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, আবহাওয়ার পূর্বাভাস ইত্যাদি কাজের জন্য তৈরি হল আই আর এস-১এ, আই আর এস-১বি ইত্যাদি উপগ্রহ। ১৯৮০ এবং ৯০-এর দশকে ইনসাট উপগ্রহগুলিকে কাজে লাগিয়ে ভারতের যোগযোগ ব্যবস্থায় জোয়ার আসে।

১৯৮৫ সালে ডক্টর রাও ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ইসরো)-এ যোগ দেন চেয়ারম্যান হিসাবে। এখানে এসে রাও রকেট প্রযুক্তির উন্নতিসাধনে জোর দেন। তাঁরই অনলস প্রচেষ্টায় ১৯৯২ সালে সফল উৎক্ষেপন হয় এ এস এল ভি রকেটের। এছাড়াও তৈরি হয় পি এস এল ভি লঞ্চ ভেহিকল যার সাহায্যে ১৯৯৫ সালে প্রায় ৮৫০ কেজি ওজনের উপগ্রহকে পোলার অরবিটে স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।

দেশের এবং বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে রাও-এর প্রায় শ'তিনেক গবেষণামূলক লেখা। এগুলি মূলত কসমিক রে, স্যাটেলাইট এবং রকেট প্রযুক্তি, হাই এনার্জি আস্ট্রোফিজিক্স ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। এছাড়াও বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন বইও লিখেছেন তিনি। তাঁর লেখা বইগুলির মধ্যে 'ফিজিক্স অফ্ দি কমিউনিকেশন', 'স্পেস এন্ড এজেন্ডা ২১ কেয়ারিং ফর দি প্লানেট আর্থ', 'স্পেস টেকনোলজি ফর সাসটেইনেবল্ ডেভেলপমেন্ট' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

দেশ এবং বিদেশের বিভিন্ন সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন ভারতের এই কৃতী বিজ্ঞানী। ১৯৭৬ সালে 'পদ্মভূষণ' এবং ২০১৭ সালে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভারত সরকার সম্মানিত করেন এই বিজ্ঞানীকে।

২৪শে জুলাই ২০১৭, দেহাবসান হয় ভারতের এই কৃতী মহাকাশ বিজ্ঞানীর।

E.mail.rdebnath1961@gmail.com • M : 9477934928

ADMISSION OPEN

Session : 2017-18

Kanchrapara Albatross School

Play group to class-viii
digi school
new building
Ph. 8013191616
03325856660

Dulux
Let's colour

NEROLAC
HEALTHY HOME PAINTS

Authorised Dealer :

SUBINOY PAUL

M. 9231545191
Workshop Road : Kanchrapara, North 24 Pgs.

সৌজন্যে :

BUNTI TRADERS & ORDER SUPPLIERS

Halisahar, Khasbati, North 24 Parganas
ALL PAINTS DEALER

WATER SOLUTION

প্লাম্বিং ও স্যানিটারির সমস্ত দ্রব্য পাওয়া যায়।

ধানকল • মোবাইল : 8240665747

All kinds of Plumbing and Sanitation items available here.

DHANKAL • Mobile : 8240665747

"BIGYAN ANNESWAK" VOL : 14 Issue No. 5 September-October 2017 WBBEN/2003/11192 Rs. 5

শব্দের খোঁজে ৩ : বিজ্ঞানী ও আবিষ্কার

পলক বন্দ্যোপাধ্যায়

১		২			৩		৪	
					৫			
		৬	৭					
৮	৯		১০				১১	১২
					১৩			
১৪								
		১৫			১৬		১৭	
১৮								
				১৯				

❑ **পাশাপাশি :**

(১) গতি সূত্রের আবিষ্কারক। (৫) মাদাম ক্যুরী এই অত্যাশ্চর্য বস্তুটি আবিষ্কার করেছিলেন। (৬) ১৯২৩ সালে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল জয়ী মার্কিন বিজ্ঞানী যিনি ইলেকট্রনের চার্জ পরিমাপ করেছিলেন। (৮) বিখ্যাত ভৌমিক পদার্থবিদ। (১১) ——— লুই বেয়ার্ড, যিনি টেলিভিশান আবিষ্কার করেছিলেন। (১৩) প্রখ্যাত ব্রিটিশ আবহাওয়াবিদ যিনি আনটার্টিকার হিমবাহ ও উষ্ণায়ণের প্রভাব সম্বন্ধে কালজয়ী গবেষণা করেছেন। (১৪) ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে গবেষণা করে ইনি ১৯০২ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। (১৬) রিচার্ড ——— তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা ও কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একজন সফল প্রণেতা। (১৮) বেল ল্যাবস্ এর প্রযুক্তিবিদ এবং একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। তিন অক্ষরে নাম। একে-তিনে দ্বিত্বে নেতিবাচক শব্দ। (১৯) ইনি সাইক্লোট্রন আবিষ্কার করেছিলেন।

শব্দের খোঁজে ২ : জলাশয়

১ বৈ	ত	র	২ নী		৩ ভা	র্গ	৪ বি	
কা			ল		বা		পা	
ল			ন			৫ প্র	শা	ন্ত
	৬ দা	৭ মো	দ	র		পা		
		হ		৮ ন	দী	ত	৯ ট	
১০ ক	য়	না					১১ কো	১২ সী
র				১৩ ব	রা	১৪ ক		কি
১৫ তো	১৬ র	সা		ন		রা		য়া
য়া		১৭ মা	ন	স		১৮ লা	চু	ৎ

একটি আলো

জগন্ময় মজুমদার

একটি আলো সরলমতি সরল গতি তার
বিদ্ধ করে যায় চলে সে সকল অন্ধকার
সূর্য দিলেন বর
পৃথিবী ছাড়াও ঘর
দিলাম তোকে ব্রহ্ম অণ্ড, সপ্ত অশ্ব ধার।

একটি আলো সরল অতি— ভাব বোঝে না ভাষা
সূর্য তাকে কি বলছে— অশ্ব অণ্ড খাসা?
হয় না কি ওমলেট
হা মুখ হা পেট
ভরবে তবে মিটবে ক্ষুধা— সূর্য দীঘল আশা।

❑ **উপর নীচে :**

(১) ইংরেজ প্রকৃতিবিদ, ইনি স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভাবন (spontaneous generation) মতবাদের প্রণেতা। (২) গ্রীস দেশের এক বিখ্যাত গাণিতজ্ঞ। (৩) রুশ পদার্থবিদ যিনি ১৯৫৮ সালে তেজস্ক্রিয় রশ্মি সম্বন্ধে আবিষ্কার করে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। (৪) পদার্থবিজ্ঞানে ১৯৮৮ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন নিউট্রিনো রশ্মি আবিষ্কারের জন্য। (৭) কার্ল ——— (দ্বিপদ নামকরণ এর উদ্ভাবক)। (৯) ——— বোর্, আনবিক কাঠামো নির্ণয় ও কোয়ান্টাম মতবাদের জন্য ইনি ১৯২২ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। (১২) ——— রামসে, atomic clock তৈরির ব্যাপারে তাঁর অবদানের জন্য ১৯৮১ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। (১৫) স্মল-পক্স এর টিকার আবিষ্কর্তা। (১৬) উইলিয়াম ——— প্রখ্যাত মার্কিন ভূতত্ত্ববিদ, তিন অক্ষরে নাম। একে-তিনে পাশের বিপরীত, দুইয়ে-তিনে, যার উপর দিয়ে ট্রেন চলে। (১৭) ——— সমর সিংহে, প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ, পদ্মের আরেক নাম।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পো ঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো ঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস ঃ রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ ● সম্পাদক ঃ তাপস মজুমদার। ফোন ঃ ৯৮৭৪৭৭৮২১৬/৯৪৭৪৩৩০০৯২
সম্পাদকমণ্ডলী ঃ বিজয় সরকার, প্রবীর বসু, শিবপ্রসাদ সর্দার, সম্রাট সরকার, অনুপ হালদার, সুজয় বিশ্বাস, বিবর্তন ভট্টাচার্য
E-mail : bijnandarbar1980@gmail.com/ganabijnan@yahoo.co.in